উন্নয়ন বিতর্ক

দশম বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা | জুন ১৯৯১

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা প্রসঙ্গে
কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শক্তিসম্পদ ও পরিবেশঃ কিছু কথা
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা

নারী উন্নয়ন– প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বিধির ভূমিকা
নাজমা সিদ্দিকী

প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা
শেখ সিরাজ উদ্দিন

রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা
মোহাম্মদ এনামুল হক

উন্নয়নে বেসরকারী সংস্থাসমূহের ভূমিকাঃ যপিআই কার্যক্রম প্রসঙ্গ
আহমদ মোশতাকুর রাজা চৌধুরী
সালেহউদ্দীন আহমদ
মুহম্মদ গোলাম সাত্তার

প্রকৌশলীদের জন্য ব্যবস্থাপনা শিক্ষা
ফিরদৌস মাহবুব-উল-হক

বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ

উন্নয়নে বেসরকারী সংস্থাসমূহের ভূমিকাঃ ইপিআই কার্যক্রম প্রসঙ্গ

আহমদ মোশতাকুর রাজা চৌধুরী *
সালেহউদ্দীন আহমদ **
মুহম্মদ গোলাম সাত্তার ***

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নে জাতীয় সরকারগুলোর পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা বা এনজিওদের অংশগ্রহণ খুব বেশী দিনের ঘটনা নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরই এদের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এনজিওদের সূত্রপাত ঘটে আরো একটু পরে–মুক্তিযুদ্ধে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে। বস্তুতঃ তৃতীয় বিশ্বের সব দেশেই এনজিও কার্যক্রম শুরু হয়েছে কোন যুদ্ধ বা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলশ্রুতিতে[১]। দেখা গেছে, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী শেষ হয়ে গেলেও এনজিওরা কিন্তু তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়নি। দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগণের দুঃখ–দুর্দশা লাঘবে দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসূচীতে তারা নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে।

তৃতীয় বিশ্বে দারিদ্র্য নিরসনে সংশ্লিষ্ট দেশ সমূহের সরকারের ব্যর্থতা এনজিও কার্যক্রম জোরদার করতে প্রেরণা জুগিয়েছে। উন্নত বিশ্ব যখন দেখলো যে, তাদের সাহায্য তৃতীয় বিশ্বের সরকারসমূহ ঠিকমত কাজে লাগাতে পারছেনা তখনই তারা

---

* প্রধান, গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক

** পরিচালক কর্মসূচী, ব্র্যাক

*** ব্যবস্থাপক, গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক

এনজিওদের একটি বিকল্প পন্থা হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করে। গত দু'দশকের সার্থক কার্যক্রম এনজিওদের এখন উন্নয়নের একটা বিকল্প মডেল হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। "Donors in the developed world turned to NGOs out of pragmatic considerations, seeing them as more efficient conduits for development input than the often discredited official agencies"[2]। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই আজ এনজিও কার্যক্রম বিস্তৃত এবং এসব দেশের গরীব জনগণ দ্বারা নন্দিত ও স্বীকৃত[৩]। বলা বাহুল্য, দাতা দেশ ও সংস্থা সমূহের কাছেও তাদের রয়েছে প্রচুর গ্রহণযোগ্যতা। ১৯৮৬ সনের একটা হিসেবে দেখা যায়, উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা থেকে তৃতীয় বিশ্বের এনজিওরা উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে পেয়েছে প্রায় ৩৩০ কোটি ডলার আর ঐ সব দেশের সরকারী সংস্থা সমূহ থেকে পেয়েছে প্রায় তার অর্ধেক[৩]। উদাহরণ স্বরূপ কানাডার উন্নয়ন সাহায্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কানাডার দেয়া মোট উন্নয়ন সহায়তার প্রায় এক-চতুর্থাংশ পেয়ে থাকে এনজিওরা[৪]।

দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের এ বিশেষ আগ্রহ এনজিওদের অবশ্য সমালোচনার বস্তুতে পরিণত করেছে[৫]। বেশীরভাগ এনজিও এখনও উন্নত বিশ্বের দানের উপর নির্ভরশীল। অবশ্য অনেকে আবার স্থানীয়ভাবে আয় সঞ্চার করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে। উদাহরণ স্বরূপ ব্র্যাক-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বার্ষিক মোট খরচের এক-তৃতীয়াংশের বেশী ব্র্যাক এখন স্থানীয়ভাবে তার নিজস্ব আয় থেকে নির্বাহ করে থাকে। এই প্রেক্ষিতে লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশকে তার বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের আশি ভাগেরও বেশী যোগানোর জন্যে উন্নত বিশ্বের দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের উপর নির্ভর করতে হয়।

এনজিওরা সাধারণতঃ খুব ছোট আকারের প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে পছন্দ করে। Small is beautiful-এটা যেন তাদেরই মর্মকথা। সাম্প্রতিক কালে অবশ্য এর ভিন্নতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটা আর এখন তেমন সত্য নয়। অনেক এনজিও-ই আজ বেশ বড়। তাদের কার্যক্রম এখন আর একটা বা দুটো গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ব্র্যাক, প্রশিকা এবং আরও অনেক এনজিও এখন যথেষ্ট বড় এবং তাদের কার্যক্রম আজ সারা বাংলাদেশ জুড়ে। ব্র্যাকের ডায়রিয়া চিকিৎসা প্রকল্প আজ বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছেছে[৬]। সহজ শর্তে ঋণ সুবিধার মাধ্যমে প্রায় চার লক্ষ ভূমিহীন পরিবার তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ পাচ্ছে এবং অনেকে তাদের আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে[৭]। প্রায় সাড়ে চার হাজার উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে লক্ষাধিক ছেলেমেয়ে শিক্ষার আলো পাচ্ছে[৮]। কোন কোন এনজিও আবার একাধিক দেশেও বিস্তৃতি

লাভ করেছে। পূর্ব আফ্রিকায় "আমরেফ" এমন একটি এনজিও যেটি একাধিক দেশ থেকে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

কোন কোন এনজিওর এ বিশালতা আবার অনেকে মোটেই পছন্দ করছেন না। তারা মনে করেন, বেশী বড় হয়ে গেলে এনজিওরা তাদের সৌন্দর্য ও স্বকীয়তা হারাবে। এসব যুক্তি অবশ্য খন্ডনও করছেন কেউ কেউ। এ ব্যাপারে শেলডন অ্যানিস-এর যুক্তি বেশপ্রণিধানযোগ্য। তিনিবলছেন৯ঃ

-"Small scale" can merely mean insignificant;

-"Politically independent" can mean powerless or disconnected;

-"Low cost" can mean underfinanced or poor quality;

-"Innovative" can mean simply temporary or unsustainable.

স্বাস্থ্য উন্নয়নে এনজিওরা

তৃতীয় বিশ্বে যেসব এনজিও কাজ করছে তাদের বেশীর ভাগেরই প্রধান উদ্দেশ্য সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা এবং তাদের পরনির্ভরশীলতা দূর করা। এ লক্ষ্যে এনজিওরা বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম হাতে নেয় যার মধ্যে রয়েছেঃ শিক্ষা, অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পশুপালন, ঋণ বিতরণ, ইত্যাদি। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এনজিওরা কি ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা সংক্ষেপে নীচে আলোচনা করা হলো।

দেশে দেশে এনজিওদের স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মোটামুটি নয় ধরনের কাজে তারা বেশী তৎপর। এগুলো হলো[৩]ঃ

<u>(১) চিকিৎসা সেবাঃ</u> শহর এবং গ্রামাঞ্চলে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছে বিভিন্ন এনজিও। গ্রাম ভিত্তিক স্বাস্থ্য কর্মীর প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে উন্নতমানের হাসপাতাল স্থাপন পর্যন্ত চিকিৎসা সেবার বিভিন্ন কাজ তারা করছে। স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষ ডাক্তারের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই বিদেশী ডাক্তার দ্বারা এগুলো পরিচালিত হচ্ছে। অবশ্য বাংলাদেশের এনজিও কার্যক্রমে বিদেশী ডাক্তারদের নিয়োগ খুব একটা দেখা যায় না।

<u>(২) রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রমঃ</u> এ জাতীয় কাজে এনজিওদের সম্পৃক্তি খুবই বেশী লক্ষ্য করা যায়। স্বাস্থ্য শিক্ষা এ সবের মধ্যে অন্যতম।

(৩) রোগ নিরাময় কার্যক্রমঃ বিভিন্ন রোগের প্রকোপ থেকে জনগোষ্ঠীকে বাঁচাতে এনজিওরা বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। যেসব রোগ নিরাময়ে তারা বিশেষভাবে কাজ করেছে সেগুলো হচ্ছে ডায়রিয়া, যক্ষা, কুষ্ঠরোগ ইত্যাদি।

(৪) পরিবার পরিকল্পনাঃ এটা সম্ভবতঃ এনজিওদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কার্যক্রম। বস্তুতঃ বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এনজিওরাই পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের প্রথম উদ্যোক্তা।

(৫) স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে গবেষণাঃ যেহেতু এনজিওরা তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় অনেক সময় ধরাবাঁধা নিয়ম-কানুনের বাইরে গিয়েও কাজ করতে পারে তাই স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা তাদের কাছে বিশেষভাবে উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছে। এভাবে তারা কর্মকৌশলের নতুন নতুন মডেল উদ্ভাবন করেছে যা অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

(৬) সরকারের প্রতি সহযোগিতাঃ ব্র্যাকসহ অনেক এনজিও মনে করে যে তাদের প্রয়োজন খুবই সীমিত সময়ের জন্য। যখনই জাতীয় সরকার কার্যকরভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে তখনই এনজিওদের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও কার্যকর করতে এনজিওরা তাই তাদের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সরকারের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী বা ইপিআই এক্ষেত্রে একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পরে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হবে।

(৭) অর্থনৈতিক সহযোগিতা ঃ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বহু এনজিও বিভিন্ন স্বাস্থ্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে সরকার ও অন্যান্য স্থানীয় এনজিওদের আর্থিক সাহায্যও দিয়ে থাকে।

(৮) অবকাঠামো তৈরীঃ হাসপাতাল বা এ জাতীয় অবকাঠামো তৈরীতে এনজিওরা সাহায্য করে থাকে। এ ছাড়া মানব সম্পদ উন্নয়নেও তারা সহযোগিতা করছে।

(৯) সচেতনতা বৃদ্ধিঃ স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে এনজিওরা প্রায়শঃই কাজ করে থাকে।

ইপিআই কার্যক্রমে এনজিওরা

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী বা ইপিআই বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল ১৯৭৯ সনে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদেরকে ডিপথেরিয়া, ধনুষ্টংকার, হাম, পলিও, হুপিং কাশি ও

যক্ষা এই ছয়টি রোগের প্রতিষেধক টিকা দেয়া হয়। যে সব মায়েরা সন্তান ধারণে সক্ষম বা গর্ভবতী তাদেরকেও ধনুষ্টংকারের টিকা দেয়া এই কার্যক্রমের লক্ষ্য[10]। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় আড়াই লক্ষ শিশু এসব রোগের কারণে অকালে মারা যায়। তা ছাড়া, এর চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যক শিশু এগুলোর প্রকোপে বিকলাঙ্গ বা অসুস্থ হয়ে পড়ে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯৮৪ সন পর্যন্ত বাংলাদেশে এই কার্যক্রমের কার্যকারিতা ছিল খুবই সীমিত, শতকরা মাত্র ২ ভাগ। ১৯৮৫ সনে সরকার নতুন চিন্তাভাবনা শুরু করে এবং ১৯৮৬ সন থেকে নবোদ্যমে এই কার্যক্রম আবার শুরু করা হয়।

১৯৯০ সনের মধ্যে অন্ততঃ ৮০ ভাগ শিশুকে এই নতুন কার্যক্রমের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে সরকারকে অনেকগুলো নতুন কাজ হাতে নিতে হয়েছে। এর একটি হলো বেসরকারী সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। ব্র্যাক, কেয়ার, ডি· এইচ· এস· এস, আর· ডি· আর· এস· ইত্যাদি সংস্থা এ ব্যাপারে এগিয়ে আসে[11]। ব্র্যাকের মতো অন্যান্য এনজিওদের জন্যে এটা ছিল খুবই একটি স্বাভাবিক পদক্ষেপ[12]। সরকারকে তার কার্যক্রম জোরদার করতে সহায়তা করা ব্র্যাকের অন্যতম উদ্দেশ্য। ১৯৮৬ সনে তাই ব্র্যাক ইপিআই কার্যক্রমে সহায়তা করতে শুরু করে। মোট পাঁচটি বিষয়ে ব্র্যাক ইপিআই-কে সহায়তা প্রদান করে[12]। এগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

<u>১। টিকার চাহিদা বৃদ্ধিঃ</u> সঙ্গত কারণেই প্রথম দিকে টিকার চাহিদা ছিল খুব সীমিত। ব্র্যাক তাই গ্রামে গ্রামে টিকার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করতে শুরু করে। কার্যক্রম এলাকায় প্রতিটি বাড়ীতে গিয়ে ব্র্যাক কর্মীরা টিকার প্রয়োজনীয়তা এবং কোথা থেকে এই সেবা পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে গ্রামবাসীদের জ্ঞাত করে। এ ছাড়াও ব্র্যাক কর্মীরা বিভিন্ন স্থানে যেমন বাজার, মসজিদ, বিদ্যালয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রচার ও আলোচনার মাধ্যমে টিকার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

<u>২। পরিকল্পনা বিষয়ে সহায়তাঃ</u> উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যায়ে কার্যক্রম শুরু করার আগে উক্ত এলাকায় কার্যক্রম পরিকল্পনা সংক্রান্ত কর্মশালায় ব্র্যাক কর্মীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

<u>৩।প্রশিক্ষণেসহায়তাঃ</u> স্থানীয় থেকে শুরু করে জেলা পর্যায় পর্যন্ত ব্র্যাক ইপিআই এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে।

<u>৪। নীতি নির্ধারণে সহায়তাঃ</u> জাতীয় পর্যায়ে ইপিআই স্টিয়ারিং কমিটির অন্যতম

ছক ১ঃ ব্র্যাক এলাকায় সবগুলো টিকা পেয়েছে এমন শিশুর হার।

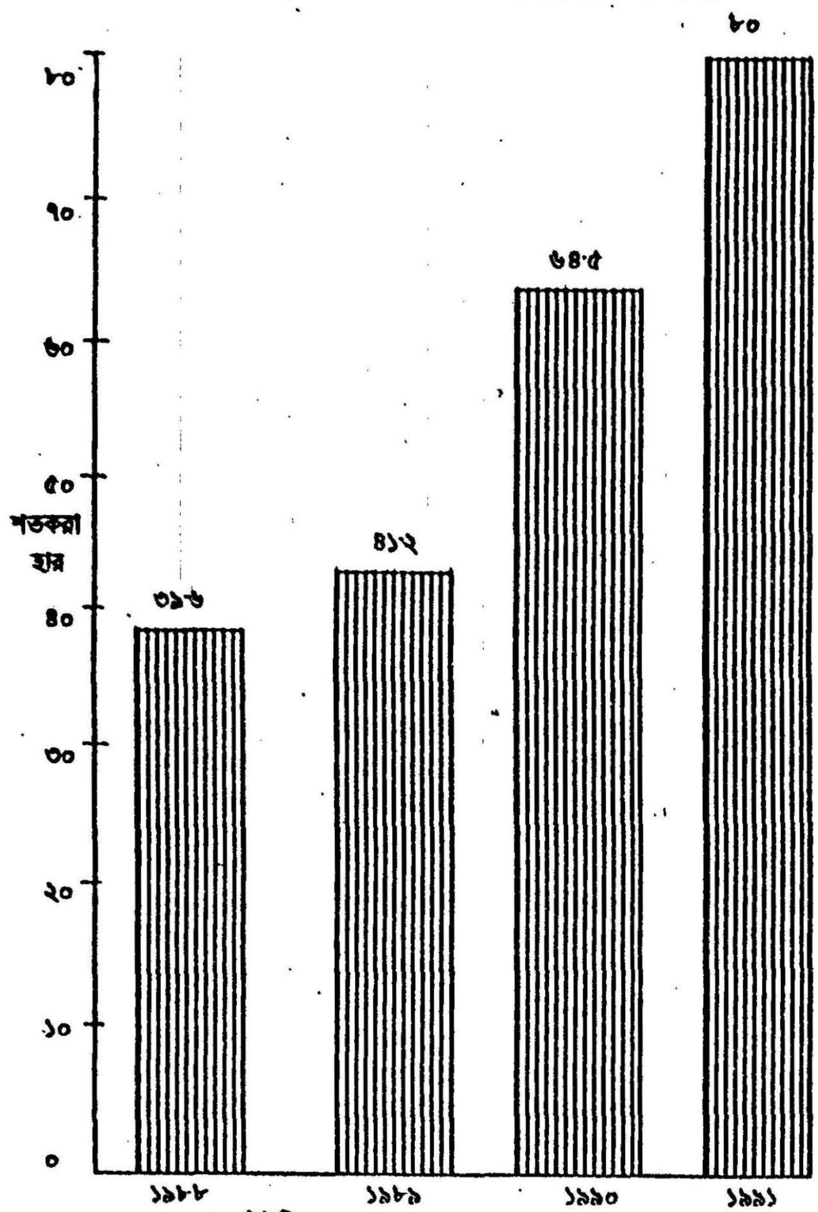

সূত্র ঃ ব্র্যাক, ইউনিসেফ

ছক ২ঃ সবগুলো টিকা পেয়েছে এমন শিশুর বিভাগ-ওয়ারী হার। (১৯৯১)

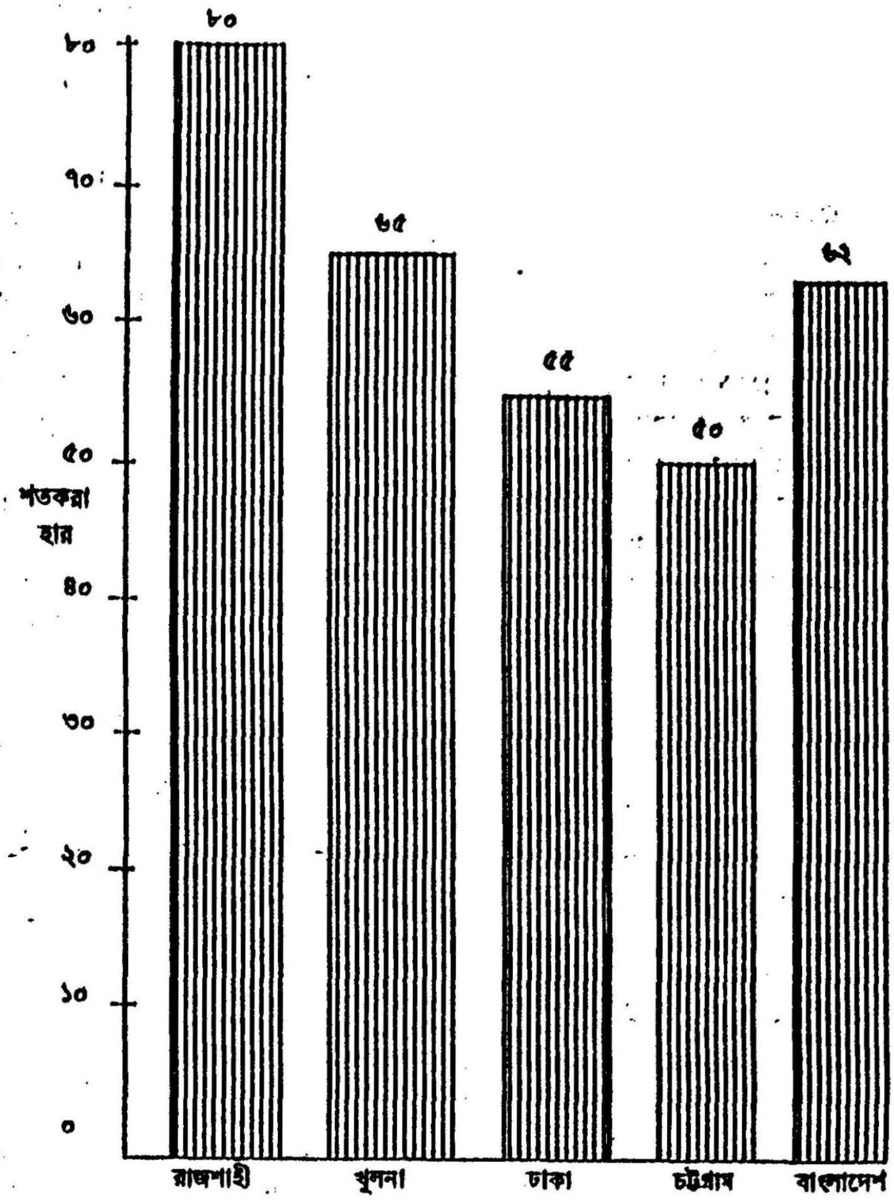

সূত্র ঃ ইউনিসেফ

স ংস্করণে ব্র্যাক বিভিন্ন জাতীয় নীতি নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

৫। গবেষণা ও মূল্যায়নে সহায়তাঃ এ ব্যাপারেও ব্র্যাক ইপিআইকে সহায়তা প্রদান করেছে। কভারেজ জরীপের মাধ্যমে ব্র্যাক সময় সময় ইপিআই কার্যক্রম মূল্যায়নে সহায়তা করেছে [১২,১৩]। এছাড়া ছয়টি রোগ ও টিকা সম্পর্কে মানুষের ধারণা (Perception) বিষয়ক একটি গবেষণাও ব্র্যাক পরিচালক করেছে[১৪]।

বাংলাদেশে ইপিআই কার্যক্রমকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। রাজশাহী বিভাগের বেশীর ভাগ উপজেলায়ই (সামান্য কয়েকটিতে আর‌ডিআরএস কাজ করেছে) ব্র্যাক সহায়তা প্রদান করেছে। খুলনা বিভাগে সহায়তা করেছে কেয়ার। কিন্তু ঢাকা বা চট্টগ্রাম বিভাগে উল্লেখযোগ্য কোন এনজিও সহায়তা করেনি এবং ঐ সব উপজেলার সরকারী কর্মচারীরা নিজেরাই সমস্ত কর্ম সম্পাদন করেছে। ১৯৮৬ সন থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি "কভারেজ" জরীপ পরিচালনা করা হয়। ছক ১-এ ব্র্যাকের কর্ম এলাকায় ইপিআই কভারেজ কিভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে তার একটি চিত্র পাওয়া যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফের যৌথ সমীক্ষা মোতাবেক সর্বোচ্চ "কভারেজ" পাওয়া গেছে রাজশাহী বিভাগে[১৫]। এবং তার পরেই খুলনা বিভাগের স্থান (ছক-২)। উল্লেখ্য যে, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে যথাক্রমে ব্র্যাক ও কেয়ার সহায়তা প্রদান করে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের সাথে তুলনা করলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, এনজিও সহায়তার ফলে শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ বাড়তি শিশু সবগুলো টিকা পেয়েছে।

আলোচনা

বাংলাদেশ তথা তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নে বেসরকারী সংস্থা বা এনজিওদের ভূমিকা নিয়েই আমাদের এ আলোচনা। এখানে দেখা যাচ্ছে, এনজিওরা উন্নয়নে বেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে এবং তারা একটি আলাদা "সেক্টর" হিসেবে মোটামুটি স্থান করে নিয়েছে। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা প্রচুর বলেই মনে হয় এবং এজন্যেই তাদের কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমভাবে, দাতা দেশ ও সংস্থার কাছেও তারা বেশ গ্রহণযোগ্য। উন্নত বিশ্বের সাহায্য সহায়তার এক বিরাট অংশ এখন এনজিওদের মাধ্যমেই প্রবাহিত হচ্ছে। এটা যে আরও বৃদ্ধি পাবে তা প্রায় নিশ্চিত। তবুও এনজিওরা এখনও অনেক সমালোচনার সম্মুখীন।

এ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী বা ইপিআই-তে ব্র্যাক এবং অন্যান্য এনজিওরা কিভাবে সহায়তা প্রদান করছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ

তুলে ধরা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, এনজিওদের সহায়তার ফলে শুধুমাত্র রাজশাহী বিভাগে ইপিআই তার লক্ষ্যমাত্রা (অর্থাৎ ৮০% কভারেজ) অর্জন করতে পেরেছে। সরকারী খাতে যেখানে প্রচুর সমস্যা১৬ সেখানে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চয়ই গৌরবের ব্যাপার। শুধু ইপিআই-তে নয়, অন্যান্য সেক্টরেও যেমন, শিক্ষা[৮], পশুসম্পদ উন্নয়ন[১৭], ত্রাণ ও পুনর্বাসন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এনজিওরা কার্যকরভাবে সরকারকে সহায়তা প্রদান করছে। এর ফলে সরকারী উদ্যোগের কার্যকারিতা অনেক বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

উৎস

১. TH Fox NGOs from the United States. World Development (Supplement). 1987.

২. V Masoni. Nongovernment organizations and development. Finance and Development 22, 1985.

৩. FH Abed & AMR Chowdhury. The role of nongovernmental organizatons in international health. In: M Reich and E Marui (eds.) International Cooperation for Health. Dover Massachusetts. Aubern House Publishing company. 1989.

৪. T Brodhead. NGOs: In one year. out the other? World Development. 15 (Supplement). 1987.

৫. এম মোঃ হক পুঁজিবাদী বিশ্ব এবং এন জি ওঃ একটি উপাখ্যান। সমাজ নিরীক্ষণ, ৩১, ১৯৯১।

৬. AMR Chowdhury. JP Vaughan & FH Abed. Mothers learn how to save the lives of their children. World Health Forum 9, 1988.

৭. আহমদ মোশতাকুর রাজা চৌধুরী, মোঃ মাহবুব ও আ আলম পল্লী দারিদ্র নিরসনে ঋণের প্রভাবঃ ব্র্যাকের কার্যক্রমের একটি মূল্যায়ন, উন্নয়ন বিতর্ক, ১০(১), ১৯৯১।

৮. C Lovell and K Fatema: BRAC's non-formal primary education programme. New york. UNICEF. 1990.

৯. S Annis. Can small scale development be large scale policy?

The case of Latin America. World Development 15 (supplement). 1989.

১০. B Dick. Issues in immunization in developing countries. Publication 7. Evaluation and Planning Centre, London School of Hygiene and Tropical Medicine. London. 1985.

১১. UNICEF. Near Miracle in Bangladesh: a booster for better health. Dhaka (in Press).

১২. AMR Chowdhury. BRAC—a case study. ADAB News. special issue. 1989.

১৩. AMR Chowdhury. EPI in Bangladesh: a study of NGO involvement and its cost-effectiveness. Dhaka. BRAC. 1990 (unpublished).

১৪. AMR Chowdhury & ZN Kabir. Perceptions about vaccination and immunizable diseases. Dhaka. BRAC. 1988 (unpublished).

১৫. UNICEF. WHO Coverage Evaluation Survey. Dhaka. February 1991 (Unpublished).

১৬. BRAC. A Tale of Two Wings: Health and Family Planning Programmes in an Upazila in northen Bangladesh. Dhaka. 1991.

১৭. S Mustafa. Impact of IGVGD on poultry workers: an exploratory study. Paper presented at the national workshop on livestock development. jointly organised by BRAC. Department of Livestock Services and Economic Development Institute (World Bank). Rajendrapur. May 1991.